দ্বিতীয় অধ্যায়

বহুখণ্ডযুক্ত আত্মজৈবনিক উপাদান সম্পন্ন উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য : ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও কল্পনার দ্বিরালাপ

আধুনিক শিল্পমাধ্যম উপন্যাস সময় সমাজের প্রেক্ষিতে কিছু উপাদানকে অবলম্বন করেই সমৃদ্ধ হয়। উপন্যাসের বিষয়ভিত্তিক নির্বাচনে আত্মজৈবনিক বা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস একটি বিশেষ বর্গভুক্ত। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস লেখকের আত্মজীবনের বিশ্লেষণ নয়। এটা রচয়িতার বিস্তৃত জীবনদর্শন, অভিজ্ঞতা ও জীবনের বিশিষ্ট উপাদানে সমৃদ্ধ, বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণে গঠিত ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন। এখানে লেখক সরাসরি চরিত্ররূপে কোথাও নেই। উপন্যাসে সৃষ্ট মুখ্যচরিত্রের অন্তরালে প্রতিসত্তারূপে লেখসত্তাকে অনুধাবন করা যায় মাত্র। এই ধরনের রচনা সম্পূর্ণতই ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন। তাই আত্মজৈবনিক শব্দটি সংযোজন করা মাত্রই তার নিজস্ব কিছু ধর্ম বা লক্ষণের উপর দৃষ্টিপাত করা জরুরি। এই ধরনের উপন্যাসে লেখকের ভ্রাম্যমান পর্যবেক্ষণ লক্ষ করা যায়। রোমন্থন পদ্ধতিতে লেখকের আত্মসমীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণমূলক বিশ্লেষণ উন্মোচিত হয়। লেখক বিস্তৃত জীবন পরিক্রমায় সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন স্পর্শকাতর ঘটনা বা মুহূর্তকে বিবৃত করতে উৎসাহী থাকেন। লেখকের জীবনে ঘটা বিভিন্ন ঘটনাকে বা জীবনে চলার পথে সম্মুখীন স্পর্শকাতর কিছু মুহূর্তকে উপাদান রূপে গ্রহণ করেন। জীবনযাত্রায় একঘেয়েমিমূলক প্রাত্যহিক বিবরণকে বর্জনের মাধ্যমে উপন্যাসের কাঠামোকে পরিমার্জিত করে সাজানো হয়। তাই এখানে স্মৃতি-নির্ভর বাস্তব উপাদানের সঙ্গে কল্পনার রস জারিত হয়ে নতুন সংযোজন ঘটে। যে কারণে একদিকে এটা উপন্যাস অন্যদিকে আত্মজীবনের উপাদানধর্মীয় রচনা।

আত্মজৈবনিক উপাদান বিশিষ্ট উপন্যাসের একটি বিশেষ লক্ষণ এটা কখনো বহুখণ্ডযুক্ত (Multi-Volumed) হয়ে থাকে। কারণ এই ধরনের রচনাকে লেখকের বিস্তৃত জীবনের জীবনদর্শন এবং

আত্মনিরীক্ষা বলা যায়। একটি খণ্ডে যেন তাঁর মূল বক্তব্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না। প্রতিবেদনের মূল বক্তব্যের সূত্র ধরেই বক্তব্যকে আরও প্রসারিত করতে, স্পষ্ট করতেই প্রয়োজন বোধ হয় আরও ধারাবাহিক খণ্ডের (Episodic Fashion)। যা আলাদাভাবে খণ্ডে খণ্ডে বিন্যস্ত হয়েও ভাবগত সাদৃশ্য বজায় রেখে সামগ্রিকভাবে অখণ্ড রূপ লাভ করে। বহুখণ্ডযুক্ত উপন্যাসে লক্ষ করা যায় বিস্তৃত কালসীমার প্রেক্ষাপট। কখনও একটি প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের ব্যবধান কিন্তু কাল, প্রেক্ষাপট আলাদা হয়েও আন্তঃসম্পর্কের সূক্ষ্ম বুননে পার্থক্য ও সমান্তরালতা রক্ষা করে চলে।

ঔপন্যাসিক আত্মজীবনের উপাদানকে সম্বল করে গভীরভাবে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে আত্মানুসন্ধানী হন এখানে। তিনি সামাজিক ও নৈতিক ধ্যান-ধারণায় আত্মনিরীক্ষণে নিজের ও চতুষ্পার্শ্বের সমস্যার আপাত মীমাংসা সন্ধানে আত্মনিয়োগ করতে চান। এই ধরনের উপন্যাস স্মৃতিনির্ভর জীবন ইতিবৃত্তের লিপিবদ্ধ দলিল নয় বরং বাস্তব জীবন উপাদান সমৃদ্ধ কঙ্কালে যেন কল্পনার মিশ্রণে সাহিত্যিক নান্দনিকতায় রক্ত-মাংসের সঞ্চার ঘটিয়ে তাকে প্রাণবন্ত করে সমাজতত্ত্বমূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। এবং প্রতিবেদনে লেখক বিস্তৃত জীবনের আহরিত অভিজ্ঞতায়, পর্যবেক্ষণে সমাজতাত্ত্বিক উপদেষ্টা রূপে ভূমিকা পালনে ব্রতী হন। তাই এই ধরনের উপন্যাসে আপনাকে আংশিক গ্রহণ করে, আপন হতে বাহিরে দাঁড়িয়ে বিশ্বলোকের দ্রষ্টারূপে ভূমিকা পালন করেন লেখক। 'সাহিত্য সন্দর্শন' গ্রন্থে শ্রীশচন্দ্র দাশের এই মন্তব্যটি প্রাসঙ্গিক মনে হয়, —

> *"প্রত্যেক ঔপন্যাসিকই জীবন ও জগতের যে রহস্য উদ্ঘাটন করিবেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য বা আলোচনা ও উপন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে থাকিতে পারে। কোন কোন ঔপন্যাসিক বিশেষ কোন তত্ত্বকথা বা জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁহার ধ্যান-ধারণা (Criticism of life) অথবা কোন সামাজিক বা নৈতিক প্রশ্ন সম্বন্ধে মীমাংসার সন্ধান দিতে চাহেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, খোলাখুলিভাবে উপন্যাসে এই প্রচার কার্য্য থাকিলে উপন্যাসের শিল্প-সঙ্গত সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হয়। কারণ, শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক স্পষ্টভাবে উপদেষ্টার বেদীতে আরোহণ করেন না। জীবনের গতি প্রগতি পাঠকের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া অপ্রত্যক্ষভাবে তিনি শিক্ষাদান করিতে পারেন।*

ঔপন্যাসিকের শিল্প-সৃষ্টির রূপ-বন্ধন (Pattern) যাহাই হোক না কেন, শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক জীবনের যে চিত্র অঙ্কন করেন, তাহা নাটকের আখ্যানভাগের মতো সুবিদিত না হইলেও ক্ষতি নাই। আপাত-অসংলগ্নতাও যদি জীবনরসে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে এবং উপন্যাসটি পূর্ণ-বৃত্ত জীবনের আভাস না দিলেও যদি জীবনের অন্তহীন সম্ভাবনা, 'not round-ing off, but opening out'-এর ব্যঞ্জনা দান করে, তবেই তাঁহার খ্যাতি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া থাকিবে।"[১]

বাস্তব এবং কল্পনা, অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতির মিশ্রিত রসে উপন্যাস নামক সাহিত্যের শাখাটি সমৃদ্ধ হয়ে নান্দনিক তাৎপর্যে উত্তীর্ণ হয়। আর এই উপন্যাসের একটি শাখাকে আত্মজৈবনিক অভিধায় অভিহিত করা হয়। যখন ঔপন্যাসিক তাঁর জীবনজিজ্ঞাসাকেই সরাসরি প্রকাশ না করে সময় এবং পরিসরের বিচিত্র কৌণিকতার প্রতিনিধিমূলক চরিত্রের নিরিখে তুলে ধরেন। আত্মজৈবনিক উপন্যাসে কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার মধ্যে আমরা দেখেছি, এই উপন্যাসগুলো বিশেষভাবে বহুখণ্ডে বিন্যস্ত (Multivolumed) এবং তার সময়সীমাও বিস্তৃত হয়। এই ধারায় প্রায় সব লেখকরা নিজের জীবন অভিজ্ঞতা, সময়ের পালাবদল এবং ব্যক্তিজীবন ও সমাজ জীবনের উত্থান-পতনকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাদের বক্তব্য একটি খণ্ডে যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কারণ এই বিশাল সময়ের পালাবদলে কয়েকটি প্রজন্মের কথা উঠে আসে যা একটি খণ্ডে বিধৃত করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

বহুখণ্ডে বিন্যস্ত বা Multivolumed সম্পর্কিত আলোচনায় সমালোচকের মন্তব্য স্মরণযোগ্য –

"The multi-volumed Novel-almost invariably self-concious and pluralistic because simultaneously both a series of discrete parts and a unity-necessarily creates and defines a context, a pattern for itself. The separate volumes must stand on their own, and yet their interrelated existances require of us a comparativist's eye and judgement, The whole becomes the sum not only of the parts but also of something more : The

interconnectedness between and through the parts that sweeps us back as well as forward as we move through the several volumes." [২]

অর্থাৎ বহুখণ্ডযুক্ত (MultiVolumed) উপন্যাসের ধর্ম হল এটা পাঠকৃতির খণ্ডগুলোর মধ্যে প্রখর আত্মসচেতনতারও বহু বাচনিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সমান্তরালভাবে একটি ঐক্য-সূত্র গড়ে তোলে। প্রতিটি প্রেক্ষিতকে সংজ্ঞায়িত করে এবং নিজের জন্য একটা আকল্প গড়ে তোলে। খণ্ডগুলো স্বতন্ত্র হয়েও প্রত্যেকটির মধ্যে আন্তঃসম্পর্কীয় যোগসূত্রের মাধ্যমে অখণ্ড ভাবরূপ লাভ করে। এবং এ ধরনের প্রতিবেদনে পাঠকের তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার বিশ্লেষণ আবশ্যিক হয়ে ওঠে। বহুখণ্ডে বিন্যস্ত উপন্যাসগুলো শুধু কতকগুলো উপন্যাসের যোগফলই নয়, একত্রে তার চেয়েও বেশি কিছু। বিভিন্ন খণ্ডের আন্তঃসম্পর্কগত পাঠের মধ্য দিয়ে যখন আমরা এগোতে থাকি আমরা ক্রমাগত ভাবনাগত দিক থেকে কখনও এগিয়ে যাই কখনও পিছিয়ে আসি। আশাপূর্ণা দেবীর ত্রয়ী 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা' দিয়েই আমরা তাকে ব্যাখ্যা করতে পারি। এই ত্রয়ীর মধ্যে প্রতিটি খণ্ড স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েও একটি অন্যটির সঙ্গে সম্পর্কিত। এখানে তিনটি প্রজন্মের ইতিহাস চিত্রিত হয়েছে। লেখিকা রচনার ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন 'সুবর্ণলতা'-র প্রসঙ্গ। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সঙ্গে এর একটি যোগসূত্র আছে। যে যোগসূত্র কাহিনির প্রয়োজনে নয়, একটি 'ভাব'-কে পরবর্তী ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনে। এভাবে 'বকুলকথা' ও তাঁর পরবর্তী ভাবের সম্প্রসারণ। কারণ লেখিকা তিনটি প্রজন্মের নারীর অবদমন এবং সংগ্রামের ইতিহাসের একটি বিবর্তন রেখা অঙ্কন করেছেন।

আশাপূর্ণা দেবীর খণ্ডে খণ্ডে বিন্যস্ত ত্রয়ী 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা' ও 'বকুলকথা'। এই ত্রয়ীতে ওঠে এসেছে মা সত্যবতী মেয়ে সুবর্ণলতা এবং তার মেয়ে বকুল এর জীবনচারণায় তিনটি প্রজন্মের নারীর অবমাননার ইতিহাস। সত্যবতীর স্বামী ও শাশুড়ি সুবর্ণলতার বাল্যবিবাহ দিয়ে সত্যবতীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। যার ফলে ঘৃণায়, ক্রোধে সত্যবতী গৃহত্যাগী হয়। সুবর্ণলতা মায়ের প্রতি অন্তরে সমব্যথী হয়েছে অন্যদিকে তার মায়ের প্রতি ছিল অভিমান। জীবনে সেও মানুষের মতো বাঁচতে চেয়েছিল কিন্তু সারা জীবন তাকে অবহেলায়, তিরস্কারে অবদমিত থাকতে হয়েছে। তার পড়াশোনার প্রতি আগ্রহকে চাওয়া-পাওয়াকে প্রতিমুহূর্তে অবমাননা করা হয়েছে। অন্যদিকে, মায়ের প্রসঙ্গ তুলে গঞ্জনা শুনতে

হয়েছে। সুবর্ণলতা মায়ের মতো গৃহত্যাগী হয়ে হয়তো প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু সমস্ত চাওয়া-পাওয়া আকাঙ্ক্ষাকে মনের মধ্যে অবদমিত রেখে সারা জীবন মনে যন্ত্রণা পোষণ করেছে। এবং শেষে সংসার-স্বামী-পুত্রের প্রতি বিমুখ হয়ে চলে গেছে। এই বোবা মনোযন্ত্রণার ফলে সে জীবনের শেষার্ধে নিজের প্রতি শারীরিক অবহেলায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে তবুও অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করেনি। সুবর্ণের মেয়ে বকুল। একমাত্র মায়ের যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করেছিল প্রতিমুহূর্তে। সুবর্ণের কায়িক অবসানের পর বকুল পণ করে মায়ের বোবা যন্ত্রণার ইতিহাস সে বলে যাবে। তাই 'বকুলকথার' অবতারণায় দেখা যায় সেখানে লেখিকা চরিত্র বকুল নিজেই। এই উপন্যাস ত্রয়ীর বিষয়বস্তু নারী অবদমনের ঔপন্যাসিক ইতিহাস। তিনটি প্রজন্মের বিবর্তন কালের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনের ভাবরূপ একটি খণ্ডে স্পষ্টরূপে ফুটে উঠত না। তিনটি প্রজন্মের মধ্যে সময়ের বিশাল ব্যবধানে, সামাজিক পালাবদলের ইতিহাসকে ও তাঁর বক্তব্যকে সম্পূর্ণতা দেওয়ার প্রয়াসে লেখিকা সম্প্রসারণ করেছেন অন্যান্য খণ্ডের। বহুখণ্ডযুক্ত (MultiVolumed) উপন্যাস এভাবেই খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়েও আন্তঃসম্পর্কীয় একটি ভাবগত যোগসূত্র রক্ষা করে অখণ্ড রূপ লাভ করে। এটাই তার গতি, নিজস্ব ধর্ম বা বলা যায় রূপ বন্ধন বা Pattern।

যে কোনো সাহিত্যকে আমরা যখন বিভিন্ন ভাগে ভাগ করি নিশ্চয়ই তার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের উপর নজর রেখেই তা করি। বহুখণ্ডযুক্ত উপন্যাসের ব্যাখ্যায় এই উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট হয় যে —

> "*The term 'multivalance' derives from chemistry, where it denominates those atoms capable of combining with other atoms in multiple combinations. Univalent atoms posses a single combining characteristic; and the word 'ambivalent' has the same etymological root univalence in fiction is essentially what we mean when we speak of authorial instrusivness, or any other device by which a single unambivalent narrative stance dominate and thus embodies the values of the book.*"[৩]

'multivalance' শব্দটি রসায়ন শাস্ত্র থেকে উদ্ভুত। একক অণুর একটা নিজস্ব সংযোজক ধর্ম থাকে

এবং ‘ambivalent’ শব্দটিরও একটি ব্যুৎপত্তিগত উৎস রয়েছে। আমরা কোনো আখ্যানের একার্থবহত্ব বলতে যা বুঝি তা হল কেন্দ্রীয় প্রতীতির ক্রমিক নির্মাণই সেই আখ্যানে বিবেচ্য। বহু শাখা-প্রশাখার অস্তিত্ব থাকলেও সমস্তই ঐ প্রতীতির অভিমুখী। আমরা যখন কোনো আখ্যানে লেখকের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে বলি তা কখনও মূল অন্বিষ্টকে অতিক্রম করে না। কোনো কৌশল বয়ন দ্বারা একক অদ্ব্যর্থবোধক আখ্যান নিজের অবস্থান গ্রহণ করে, নান্দনিক মাত্রার আধিপত্য বিস্তার করে এবং মূল্যবোধগুলিকে সাকার করে তোলে। আলোচ্য আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের প্রায় সবক’টি ‘বহুখণ্ডে বিন্যস্ত’ অর্থাৎ 'multivolumed'। বহুখণ্ডযুক্ত বা ইংরেজি 'multivolumed' শব্দটির মূল উৎস রসায়ন শাস্ত্র (chemistry) থেকে জাত। এই শব্দটির অর্থগত সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ রেখেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা যায়। 'multivolumed' শব্দটি chemistry বা রসায়নবিদ্যার অন্তর্গত multivalance শব্দ থেকে গৃহীত। রসায়ন শাস্ত্র মতে, এমন অনেক ছড়ানো ছিটানো ছোট ছোট অণু থাকে যা সমন্বিত হয়ে একটির সঙ্গে অন্যটি বন্ধনী তৈরি করে। বৈজ্ঞানিক তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে অর্থগত দিক থেকে তার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। জীবনের বহুতলযুক্ত উপস্থাপনাই এর লক্ষ্য।

বহুখণ্ড যুক্ত উপন্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় লেখকের জীবন-অভিজ্ঞতার বিভিন্ন ছড়ানো ছিটানো ঘটনা বা উপাদানের মধ্যে সাদৃশ্য রেখে লেখক বন্ধনী তৈরি করেন। রসায়ন শাস্ত্রের এই তত্ত্ব-বীজটির অর্থগত সাদৃশ্য ধরেই সাহিত্যের শাখা উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা তাকে মেলাতে পারি। লেখক উপন্যাসের একটি খণ্ডে মূল বয়ানকে তুলে ধরলেও বিশাল সময়ের প্রেক্ষাপটে অনেক কথা বাদ থেকে যায়। এই বাদ পড়া অস্পষ্ট বয়ানকে সম্প্রসারিত করার জন্যই প্রয়োজন বোধ করেন আরও খণ্ডের। এখানে প্রত্যেকটি অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ আবার একটির সঙ্গে আরেকটি ঘটনার যোগসূত্রে ঐক্য বজায় রেখে চলে সমান্তরালতায়। আর ঠিক এখানেই এই বহুখণ্ডযুক্ত বা 'Multivolumed' উপাদান নিজের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। একটি বয়ানকেই ধাপে ধাপে সময়ের ব্যবধানে প্রসারিত করে মাত্র। 'Multivolumed' বা বহুখণ্ড যুক্ত প্রতিবেদনের প্রয়োজন এখানেই।

বহুখণ্ডযুক্ত (Multivolumed) উপন্যাসকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন 'Trilogy' বাংলায় ‘ত্রয়ী’ বা ‘ত্রিলেখ’, সাগাধর্মী উপন্যাস ইত্যাদি। প্রাথমিকভাবে 'Trilogy' বা ‘ত্রয়ী’ উপন্যাস হল একই বয়ানের সম্প্রসারণে তিনটি খণ্ডে বিন্যস্ত ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনের অখণ্ড রূপ। সাগাধর্মী (Saga)

উপন্যাসে সাধারণত ছয়টি খণ্ড বিন্যস্ত থাকে। ইউরোপীয় সাহিত্যে C. P Snow's এর এগারো খণ্ডের উপন্যাস 'Strangers and Brother's' 'Rebinson crusoe' এবং De Sades- এর Justine and Juliette এবং Scott এর উপন্যাসগুলোও এই খণ্ড খণ্ড উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যে রচিত হয়েছে। 'ত্রয়ী', 'সাগাধর্মী' ইত্যাদি বহুখণ্ড বিশিষ্ট উপান্যাসগুলো তার কিছু স্বকীয়তা, বিশেষত্ব নিয়ে গঠিত হয়। Multivolumed উপন্যাসের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যকে আমরা শনাক্ত করে তাকে বুঝতে পারি। Multi-valent তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনায় জনৈক সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে —

> "*The roman fleuve and Bildungsroman predominate, and their endlessly extendable structure unposes no necessary limit marks little formal distinction among five-volume Sequences (Scott's waverley novels, cooper's. Leatherstocking tales), Six volume. (Trolope's Barsetshire and palliser novels, Farrell's Danny O'Neill Series), the dozen or so volumes in Galsworthy's Forsyte choronicles powell's Music of time' Sinclair's Lanny Budd Series, Snow's 'Strangers and Brothers, the Fifteen volumes of Henry Williamson's A cronicle of Ancient Sunlight, the tweety-seven volumes of Jules Romains' Man of good will, or even the nearly one hundred volumes of Balzac's Human comedy. The only significant distinction concerns that between one running story (Farrell, Galsworthy) and many stories connected under a looser rubric (Scott, Balzac). Only a few multivolume novels seem capable of this sort of length without assuming the form of the roman fleuve : Proust's seven-volume A la recherche du temps perdu, Faulkner's Fourteen-volume yoknapatawpha cycle, Salinger's still-emerging Glass family*

Saga. These last cited are all complexly dynamic in their unfoldings, highly wrought and richly imaginative fictional constructs, For proust's, Faulkner, and Salinger brilliantly create the rich patterning of a highly wrought short story where the very lenghts of their works would seem to demand the easy.temporality of the roman fleuve."[৪]

বহুখণ্ডযুক্ত উপন্যাস (Multivolumed) সব সময় একটি ধারবাহিকতা রক্ষা করে চলে। একটা নির্দিষ্ট গতিতে তার যাত্রা চলতে থাকে। ইউরোপীয় সাহিত্যেই তার সূচনা হয়েছে–

"*In their simplest form, multivolume Novel offer linear sequels in the episodic fashion of the pictresque.or the cronicle from of the roman fleuve. They may differ in setting and mood. but structurally and morally. They are often identical.*"[৫]

সাধারণভাবে 'multivolume' উপন্যাস বহুখণ্ডে চিত্রিত হয় এবং রোমান ফ্লেভ জাতীয় রচনার মতো ইতিবৃত্তিমূলক হয়, তারা বিন্যাস ও ভাবগত দিক দিয়ে পৃথক হয় কিন্তু কাঠামোগত এবং নৈতিকভাবে তারা প্রায়ই অভিন্ন হয়ে থাকে। উপন্যাসের এই যে ফর্ম তা খণ্ডে খণ্ডে পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলে। লেখকের মানসিকতা বা মেজাজ এবং রচনার গ্রন্থনার মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। তার কাঠামোগত দিকটি লেখকের নৈতিক উদ্দেশ্যটিকে বজায় রেখেও লেখকের মূল বক্তব্যের পূর্ব-নির্ধারিত একটি পরিকল্পনার বাহক হয়ে ওঠে। অর্থাৎ লেখকের ভাবাদর্শ (ideology) অভিজ্ঞতা, নৈতিকতা, সমাজতাত্ত্বিকতা ইত্যাদির সূক্ষ্ম বিচারে উপন্যাসের বাস্তব, অন্তর্বাস্তব এবং কল্পনার সংমিশ্রণে তার নিজস্ব নান্দনিকতা পরিস্ফুট হয়। লেখকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের ভ্রাম্যমান গতি তার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করতে, বিভিন্ন ঘটনা বলতে গিয়ে বিচিত্র পথে এগিয়ে চলে। কিন্তু সেই ঘটনার নৈতিক মূল্য এবং নিজের ভাবাদর্শকে সচেতনভাবে ব্যাখ্যা করে বিচিত্র পথ পরিক্রমা করলেও নিজের মূল গতিতে ফিরে আসতে সচেষ্ট থাকে। বিস্তৃত সময়কালে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ অভিজ্ঞতায় এক ধরনের দার্শনিক মতামত স্থির হয়ে যায় লেখকের ভেতর। এটা শুধু তাঁর জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ নয়। জীবনের পারিপার্শ্বিক এবং সমাজজীবনের

ইতিহাসের নির্যাসও তা, যার নৈতিক মূল্য নির্ধারণের ভার পাঠকের উপর থেকে যায়।

এই ধরনের উপন্যাসে সরাসরি লেখকের উপস্থিতি স্পষ্ট হয় না। যেহেতু এটা আত্মজীবনী নয় তাই লেখকের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি কাম্যও নয়। কিন্তু লেখকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরাসরি স্পর্শকাতর বিভিন্ন উপাদনের আধারে রচিত বলে লেখকের জীবনের মুখ্য দর্শনটিই স্থান লাভ করে। এ ধরনের রচনাকে রচয়িতার সমস্ত জীবনব্যাপী সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, জীবন-সংঘাতের বাস্তব এবং কল্পনার দ্বিরালাপে সমৃদ্ধ দলিল বলা যায়। লেখক এখানে সরাসরি কথকরূপে উপস্থিত নন তার প্রতিসত্তা রূপে একটি মুখ্য চরিত্রকে খুব সূক্ষ্মভাবে সংস্থাপন করে নেন।

এই ধরনের উপন্যাসে বাখতিন কথিত 'বিল্ডুঙ্গস রোমান বা জীবন সম্পর্কে পাঠই প্রধান থাকে। কারণ প্রাণের তাগিদে আমরা সবাই প্রাত্যহিক জীবন চর্যায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু জীবনকে সূক্ষ্মভাবে ভাবতে শিখি না। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা বেশিরভাগ লোকই তাকিয়ে থাকি কিন্তু দেখি কয়জন। জীবন সম্পর্কে পাঠ নিতে হলে প্রাণের সঙ্গে অর্ন্তচেতনার জাগরণও প্রয়োজন। যা সবসময় মানুষের অন্তরাত্মাকে নাড়া দেয়। জীবনানন্দ বলেছিলেন, মানুষ মরে গেলেও মানব বেঁচে থাকে। তাই লেখকের জীবনের পাঠ শুধু জীবন সম্পর্কে সীমাবদ্ধ নয়। তা আমাদের কথা, একটি বৃহৎ সমাজের, একটি নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার কথা। সাহিত্য বা উপন্যাস তো মানব জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। সেই ছবিকে সবাই উপলব্ধি করতে পারে না, পারলেও বিশেষ দৃষ্টিকোণের সূক্ষ্ম বিচার দক্ষতা থাকে না। লেখক তাঁর অভিজ্ঞতার জীবনাদর্শকে শৈল্পিক বন্ধনে সাহিত্যে রূপ দিয়ে সাধারণের সামনে তুলে ধরায় প্রয়াসী হন। এই ধরনের উপন্যাস তার একরৈখিক পথ ছেড়ে অবলম্বন করে বহুরৈখিকতাকে।

বহুখণ্ডে বিভক্ত উপন্যাসের নানা দিক রয়েছে। উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রের বিবৃতিতে ঘটনার আবর্ত তৈরি হয়। ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনের স্বরূপ উদ্ঘাটনে এখানে বিভিন্ন প্রক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন প্রাসঙ্গিক ঘটনার সমাবেশে মূল বক্তব্যকে সম্প্রসারিত করেন। পরিপ্রেক্ষিতের বহুত্ব এই উপন্যাসের আরেকটি কেন্দ্রবিন্দু। এই ধরনের উপন্যাসে সময়ের ব্যাপ্তি আরও একটি লক্ষণ। সময়ের পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রজন্মের উন্মেষে তার প্রেক্ষিতও পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হতে বাধ্য। পরিবর্তনের ফলে ধাপে ধাপে তার পরিপ্রেক্ষিত বহুত্ব লাভ করে। এক্ষেত্রে একটি উদ্ধৃতির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে —

"*The personal moodes-participant narration and third person.*

Subjective – are often compounded in a "multiples" form that opposes the concept of time as meaningful change and instead emphasizes the "Frozen reality" of constructing perspectives."[৬]

এখানে 'Frozen reality' শব্দটির বাংলা পরিভাষা করা যেতে পারে 'হিমায়িত বাস্তব'। অর্থাৎ বাস্তব ঘটনাগুলো সময়ের বিস্তর ব্যবধানের শিথিলতায় যেগুলো অবিন্যস্ত হয়ে পড়ে। লেখকের জীবন অভিজ্ঞতায় এই বাস্তবগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ হারিয়ে যায় না, যা অবচেতন মনে পুঞ্জীভূত থাকে। যা তার রচনায় প্রেক্ষিতরূপে উদ্ঘাটিত হয়। এই সমাজ-বাস্তবতা একমাত্রিক বা একরূপের হয় না। কারণ প্রত্যেকটি সাধারণ-অসাধারণ চরিত্র অঞ্চল ভেদে নিজস্ব সমাজ, পরিবেশ, জাতি, ধর্ম ও জীবনের সংঘাতপূর্ণ বাস্তবের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে লেখকের পর্যবেক্ষণে, ব্যাখ্যায় তা বিধৃত হয়। উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক ঘটনাগুলোর বাস্তবতার এই অবিন্যস্ত কোলাজগুলোই লেখকের জীবন-অভিজ্ঞতার-দর্শনের পুঞ্জীভূত সামগ্রী যা রূপায়িত হয় শিল্প সাহিত্যে। জীবন অভিজ্ঞতায় ছড়ানো, ছিটানো ঘটনাগুলো উপন্যাসের ছাঁচে কার্যকর হওয়ার পরই স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হয়ে থাকে। এ্যালেন ওয়ারেনের আরেকটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য মনে হয় এই ধরনের উপন্যাসের আলোচনার ক্ষেত্রে।

"*Multivalance is a double-edged term it applies equally to multiple ways of viewing and to multiple ways of being seen.*"[৭]

'Multivalance' বা বহুখণ্ড শব্দটির দুইটি প্রান্তযুক্ত অর্থ থাকে যা সমান্তরালভাবে দৃষ্টিভঙ্গির দ্বৈত অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক, লেখক যে বহুকৌণিক দৃষ্টিকোণ থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তার আলেখ্য বহন করে এই ধরনের উপন্যাস। যখন কোনো রচনা পাঠের পর উপন্যাসে ভেতর থেকে তার নির্যাস অবলোকন করি। সেখানে খুবই সূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্নভাবে লেখকের নৈতিক উদ্দেশ্য বা উপন্যাসের 'নৈতিক' কেন্দ্রবিন্দুটি উদ্ভাসিত হয়। সূক্ষ্ম নৈতিক জ্ঞানই মহৎ কিছুকে সৃষ্টি করে। জীবনের বিচরণভূমি থেকে আহরিত অভিজ্ঞতায়, ঘটনায় নৈতিকতা অনৈতিকতার অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হয় লেখক-মন। তার মতাদর্শ এবং চতুর্ষ্পার্শ্বের জনজীবন, সামাজিক, রাষ্ট্রব্যবস্থা, ছড়ানো ছিটানো ঘটনাবলী তাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়, ভাবায়। তখনই কিছু 'নৈতিক' মতাদর্শ নিয়ে মহৎ কিছু সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে ধাবিত হয় লেখক সত্তা।

কিন্তু এখানে সাহিত্যিক গুণাবলীর বিচারে তাকে তার উদ্দেশ্য ও আখ্যানের মধ্যে সাযুজ্য রেখে ঐক্যতা বহন করে চলতে হয়।

কোনো রচনা পড়তে গিয়ে যখন ব্যতিক্রম কিছু নজরে পড়ে, তখনই তা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ব্যতিক্রমই তার নিজস্বতা বা নতুনত্ব যা প্রচলিত রীতি বিসর্জন দিয়েই আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। আত্মজৈবনিক উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য বলে অভিহিত করা যায় তার খণ্ডে খণ্ডে বিন্যস্ত ধরনকে। এই নতুন ধরনে একটার পর অন্য আরেকটা খণ্ডকে সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে লেখককে খুব সচেতন থাকতে হয়। 'শেষ হয়েও হইল না শেষ' এর অতৃপ্ত বাসনাকে পূর্ণ করতে তার ভাবাদর্শকে অখণ্ড রূপ দিতে গিয়ে শেষেও একটা অতৃপ্তির আমেজ রয়ে যায়। সমালোচক মন্তব্য করেছেন যে –

> "*The modernity of multivalent fiction results from a double self-conciousness; that of on engaging and multiply viewed narrator or implied author, and that of the novel itself seemingly obsessed with its own identity as a work of art and its relationship to those who experience it. In "modern" fiction, this awareness is often embodied in the form of a self-dramatized narrator whose focus is the telling as much as the tale.*"[৮]

বহুখণ্ডযুক্ত উপন্যাসের রচয়িতাকে দ্বিগুণ আত্মসচেতন থাকতে হয়। কারণস্বরূপ উপন্যাসের মূল চরিত্রের সঙ্গে প্রতীত লেখক সত্তা জুড়ে থাকে, কিন্তু সরাসরি ধরা দেয় না। তার ভাবাদর্শ, জীবনদর্শন, বক্তব্য মূল চরিত্রটির দৃষ্টিতেই তুলে ধরেন। এই ধরনের উপন্যাসে লেখককে পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনারই বাহক হতে হবে। তাই তার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে খণ্ডে খণ্ডে ক্রমাগত লক্ষ্যের প্রতিই ধাবিত হতে হয়। এভাবে রচয়িতা বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশে তার শিল্পিত সাহিত্যে আত্মপরিচয় এবং আত্ম অভিজ্ঞতার যুগলবন্দিতে আত্মনাট্য (self-dramatlzed) তৈরি করে চলেন। রচনার পরতে পরতে বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যায় নিজের ভাবাদর্শকে, বক্তব্যকে পেঁয়াজের খোসার মতো খুলতে থাকেন। এখানে মুখ্যত আলোকপাত করা হয় গল্পের চেয়ে তার বক্তব্যের উপর।

আধুনিক সাহিত্য শাখার অন্যতম আধার উপন্যাস। সময়ের পালাবদলের সঙ্গে, লেখকের নিজস্ব গুণে, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উপন্যাসে নানা মাত্রার সংযোজন ঘটেছে। বিষয়ভিত্তিক এবং কিছু উপাদানের সমাহারে আত্মজৈবনিক উপন্যাস রূপে একটি ধারার প্রবর্তন হয়েছে। এই ধরনের উপন্যাসে একটি প্রধান style বা শৈলী হচ্ছে – এগুলো খণ্ডে খণ্ডে বিন্যস্ত হয়েও একটি ধারাবাহিকতার মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করে চলে।

আত্মজীবনী ও আত্মজৈবনিক উপন্যাসের ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞায়ন অবশ্যই ভিন্ন মাত্রার দাবি রাখে। আমরা যখনই 'আত্মজৈবনিক' শব্দটির সঙ্গে 'উপন্যাস' শব্দটি যুক্ত করি ঠিক সেই মুহূর্তেই বুঝে নেই তার প্রকৃতিগত রূপান্তরকে। কোনো বস্তুকে যখন আমরা দেখি এবং তার ব্যাখ্যা করি তখন আমাদের ভাবনা, উপলব্ধি মিশে তা অন্য রূপ লাভ করে। উপন্যাস রচনায় লেখককে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, উপলব্ধি এবং সাহিত্যের প্রাথমিক শর্ত রক্ষার জন্য কিছুটা গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে কল্পনাশ্রয়ী হতে হয়। কারণ কল্পনা ছাড়া উপন্যাসিকরণ বা উপন্যাসায়ন সম্ভব নয়। জীবন এক অনিশ্চিত প্রবাহ, বাস্তবে জীবনে সব পূর্বধার্যমতে ঘটে না। সাহিত্যে জীবন অভিজ্ঞতার কথা বলতে গেলে তাকে একটা ছাঁচের মধ্যে ঢেলে সাজাতে হয়। তার জন্য কল্পনা প্রয়োজনীয়। তখন বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কল্পনার দ্বিরালাপ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। জীবন বাস্তব ঘটনার 'Photocopy' নয় অর্থাৎ যা আছে, তারই অনুকরণ নয়। বাস্তবে জীবনকে আমরা যেভাবে যাপন করি যখন তা অনুভবে, উপলব্ধিতে, অভিজ্ঞতায় পৌঁছায়, এই অভিজ্ঞতাই কল্পনার অঙ্গ সজ্জায় সাহিত্য হয়ে ওঠে। বাস্তব ঘটনাকেও ভাষায় বোঝাতে হলে বর্ণনার সময় কথকের ব্যাখ্যায় তা রূপান্তরিত হয়ে ধরা দিতেও পারে, এটাই সাহিত্যের সত্য। লেখক নিজের বুদ্ধি, যুক্তি দিয়ে বহির্বাস্তবকে পর্যবেক্ষণ করেন অন্তর্লীন বিশুদ্ধীকরণের (Filtering) মাধ্যমে। জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত মূল নির্যাসসটুকুই তুলে ধরেন তাঁর সাহিত্যে পরোক্ষ বাচনে। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস আত্মজীবনের উপাদানকে সম্বল করে গড়ে উঠলেও আত্মজীবনের অভিজ্ঞতা ও ভাবাদর্শ এবং লেখকের কল্পনার সংমিশ্রণে আধারিত বলে অন্য মাত্রা পায়। সাহিত্যের সত্য এবং বাস্তব সত্যের প্রকৃতি ভিন্ন। এই ব্যাখ্যার স্পষ্টীকরণে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাহিত্য' নামক প্রবন্ধটিতে অন্তর্ভুক্ত বক্তব্যের প্রসঙ্গ অনুধাবনযোগ্য –

> *''যেমনটি ঠিক তেমনি লিপিবদ্ধ করা সাহিত্য নহে। কারণ, প্রকৃতিতে যাহা দেখি তাহা আমার কাছে প্রত্যক্ষ, আমার ইন্দ্রিয় তাহার সাক্ষ্য দেয়। সাহিত্য*

যাহা দেখায় তাহা প্রাকৃতিক হইলেও তাহা প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং সাহিত্যে সেই প্রত্যক্ষতার অভাব পূরণ করিতে হয়।.....সাহিত্য যাহা আমাদিগকে জানাইতে চায় তাহা সম্পূর্ণরূপে জানায়; অর্থাৎ স্থায়ীকে রক্ষা করিয়া, অবান্তরকে বাদ দিয়া, ছোটোকে ছোটো করিয়া, বড়োকে বড়ো করিয়া, ফাঁককে ভরাট করিয়া, আলগাকে জমাট করিয়া দাঁড় করায়। প্রকৃতির অপক্ষপাত প্রাচুর্যের মধ্যে মন যাহা করিতে চায় সাহিত্য তাহাই করিতে থাকে। মন প্রকৃতির আর্শি নহে; সাহিত্যও প্রকৃতির আর্শি নহে। মন প্রাকৃতিক জিনিষকে মানসিক করিয়া লয়; সাহিত্য সে মানসিক জিনিষকে সাহিত্যিক করিয়া তুলে।"[৯]

প্রকাশভঙ্গি এবং ভাষার ব্যবহার লেখকের লেখনীর স্বতন্ত্রতার পরিচায়ক হয়ে ওঠে। কোনো ছোট ঘটনাও বলার ভঙ্গিতে, ভাষার ব্যবহারে, বাগ্মিতায় আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। আবার খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও অবহেলার সঙ্গে বললে তুচ্ছ মনে হয়। যেকোনো ঘটনা হুবহু আমাদের কাছে 'Photocopy' এর মত ধরা দেয় না। কোনো একটি ঘটনাকে উপস্থাপিত করতে গিয়ে তা ব্যক্তি বিশেষে, দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে, প্রকাশের ধরনে পরিবর্তিত হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাস্তব উপাদানকে গ্রহণ করে রচয়িতা অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও কল্পনার সংমিশ্রণে তার বয়ানকে নান্দনিক মর্যাদায় উত্তীর্ণ করতে প্রয়াসী থাকেন। মানুষ প্রতিটি মুহূর্তে তার যাপিত জীবন থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সাধারণ মানুষ তা জবানীতে প্রকাশ করেন। আর সচেতন বুদ্ধিজীবী সমাজতত্ত্ববিদ বা সাহিত্যিকরা তার অভিজ্ঞতা সম্বলিত অভিব্যক্তিকে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশীল ধ্যান-ধারণায় প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে সচেষ্ট হন। যেকোনো রচনা সাহিত্যিক মর্যাদায় উত্তীর্ণ হতে হলে তাকে সাহিত্যের শর্তগুলো পূরণ করতেই হয়। সাহিত্যে কল্পনা অবশ্যম্ভাবী কিন্তু সে কল্পনা অলীক হলে রূপকথা হয়ে যায়। উপন্যাস রচনার মূল বিষয়টি বাস্তবনির্ভর, আবার তা সাহিত্যিক মর্যাদায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কল্পনার সৌন্দর্য দরকার। বাস্তব, অভিজ্ঞতা এবং কল্পনার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হয়। কল্পনা যেন বাস্তবকে ছাড়িয়ে না যায়। অর্ধেক বাস্তব অর্ধেক কল্পনার সঙ্গে মনের মাধুরী মিশিয়ে সাহিত্যের সৃজন। মানুষ সমাজে বাস্তব জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এই অভিজ্ঞতাগুলো সবসময় সচেতন শিল্পীমনের ভাবাবেগে নাড়া দেয়। এই অভিজ্ঞতাগুলোর বিশ্লেষণাত্মক রূপ তুলে ধরতে সাহিত্যিকরা একটি মাধ্যমের আশ্রয় নেন। উপন্যাসও ঠিক তেমনই একটি মাধ্যম। সেখানে প্রত্যেকটি

ঘটনা অভিজ্ঞতা, বাস্তব জীবন কল্পনার রসে জারিত হয়। বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণে জীবনের সম্ভাবনাময় পথে মীমাংসা সন্ধানের চেষ্টা করা হয়।

আধুনিক শিল্প-শাখার নতুন মাধ্যম উপন্যাস কাহিনির মোহজাল অতিক্রম করে আজ বিভিন্ন রূপরেখা নিয়ে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। আধুনিক যুগে নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস কখনও বাস্তব সমাজের দলিল বা দর্শনরূপে আমাদের সামনে উঠে এসেছে। কখনও তা অস্থির সংঘাতময় সময়ের দলিলরূপে, জাতির জীবনের ইতিহাসকে ধারণ করেছে। কখনও আবার স্বাধীনতাকামী জাতির জীবনে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন পূরণের আকাঙ্ক্ষার স্মারকরূপে, চেতনা জাগরণের মন্ত্রে জাতির মেরুদণ্ডকে উজ্জীবিত করার জন্য। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহিত্য-শাখার দিক আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছে। আমাদের আত্মরক্ষায় সংগ্রামে উদ্দীপনা জাগানোর জন্য সচেতন সাহিত্যিকরা সাহিত্যকেই মাধ্যম করেছেন।

'Multivolumed' বা বহুখণ্ডযুক্ত উপন্যাস জীবন ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট দিক। এই সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমারই এক একটি বাঁক যেন এক একটি খণ্ড। এক একটা খণ্ড যেমন একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব স্থান ও দিক নির্দেশ করে। আবার এই স্থান থেকেই পরবর্তী গন্তব্যের যাত্রারম্ভ সূচিত হয়। বহুখণ্ড যুক্ত উপন্যাস ঠিক যেন শিল্পীর দীর্ঘ বিস্তৃত জীবন অভিজ্ঞতার, পথ পরিক্রমার, জাতির জীবনের বিস্তৃত সংঘাতময় টুকরো টুকরো ঘটনার মিশ্রিত সমাবেশ।

এই উপন্যাসগুলো মূল ভাব ও বিষয়বিন্যাসের ফলে তার প্রতিটি খণ্ড আন্তঃসম্পর্কিত কিন্তু বিস্তৃত সময়, পরিসরে চরিত্রের ঘনঘটায় প্রসঙ্গক্রমে নিজস্ব কিছুটা স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে চলে। লেখকের সমস্ত জীবনব্যাপী অর্জিত অভিজ্ঞতা, অতিবাহিত জীবনের মর্মকথা, সমসাময়িক সমাজ বাস্তবতা এবং তার মূল বক্তব্য অনেক সময় একটি খণ্ডে যেন সংক্ষিপ্ত অস্ফুট, অস্পষ্ট থেকে যায়। লেখক তার মূল বক্তব্যকে স্পষ্টতর করার উদ্দেশ্যে তাকে আরও প্রসারিত করতে চান। এভাবেই বহুখণ্ডে খণ্ডিত উপন্যাস একটি নতুন আদল ও রূপ পেয়ে যায়। তাছাড়াও সাতখণ্ড, এগারো খণ্ডে বিন্যস্ত উপন্যাসও ইউরোপীয় সাহিত্যে দেখা যায়। ইউরোপীয় সাহিত্যে C.P Snow's এর এগারো খণ্ডে বিন্যস্ত উপন্যাস 'Strangers and Brothers' একই রকম 'Robinson crusoe এর, 'De Sades' এর Justine and Juliette 'Scott' এর উপন্যাসগুলোতেও এই ধরন পরিলক্ষিত হয়।

ইউরোপীয় ও বাংলা সাহিত্যে এই নতুন 'style' এর নানা নমুনা আমরা পেয়েছি। এই

উপন্যাসগুলোকে শ্রেষ্ঠ উপহার হিসাবে আমরা পেয়েছি। এই উপন্যাসগুলো তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যেই অনন্যতা পেয়েছে। এই ধরনের উপন্যাসে জীবনের জটিল সমস্যাগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। উপন্যাসগুলো মূলত মনন প্রধান, চেতনাপ্রবাহমূলক, লেখকের আত্মানুসন্ধানের বিবরণ তাতে স্পষ্ট হয়।

বাংলা সাহিত্যের সুবিস্তৃত অঙ্গনেও আমরা এর পরিচয় পেতে পারি। তার মধ্যে বাঙালি হৃদয়ের কাছের সুপরিচিত লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'শ্রীকান্ত' চারটি খণ্ডে বিন্যস্ত। পরবর্তীকালে অখণ্ডরূপে প্রকাশিত। 'শ্রীকান্তের তৃতীয় খণ্ডের সমাপ্তিতে তার অস্পষ্ট বক্তব্যগুলোকে প্রসারিত করতে চতুর্থ খণ্ডের অবতারণা।

বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের আরও উপন্যাস লিখিত হয়েছে। যেগুলো একত্রে 'ত্রয়ী' 'ত্রিলেখ' বা ইংরেজি 'Trilogy' রূপে পরিচিত। আমরা পেয়েছি একটি নির্দিষ্ট বয়ানকে কাহিনি বা প্রজন্মের ধারাবাহিক বিবর্তনের গ্রন্থনায় সম্প্রসারিত রূপ বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী', অপরাজিত ও পরবর্তীতে 'কাজল'। কাজল লেখার বাসনা তিনি জীবিতকালে পূর্ণ করতে পারেননি। তার একমাত্র পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তা পরবর্তী সময়ে রচনা করেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা, 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম'। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র 'উপন্যাস ত্রয়ী' 'অন্তঃশীলা'-'আবর্ত'-'মোহানা', গোপাল হালদারের 'ত্রিদিবা', আরও একটি ত্রিলজি 'পঞ্চাশের পথ'-'তেরশ পঞ্চাশ'-'উনপঞ্চাশী'। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ট্রিলজি, 'কলকাতার কাছেই'- 'উপকণ্ঠে'-'পৌষ ফাগুনের পালা'। দুই খণ্ডে বিন্যস্ত 'পঞ্চকন্যা'। অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছয় খণ্ডে বিন্যস্ত 'সত্যাসত্য'। চিত্তরঞ্জন মাইতির ট্রিলজি – 'নির্জনে খেলা'-'নির্ঝরের গান'-'তিন্নির রোদ আর বৃষ্টি'। প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকা'। তিন পর্বে বিন্যস্ত অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'অলৌকিক জলযান', 'ঈশ্বরের বাগান'। সমরেশ মজুমদারের ট্রিলজি 'উত্তরাধিকার', 'কালবেলা', 'কালপুরুষ'। আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা'। সেলিনা হোসেনের তিনখণ্ডে বিন্যস্ত 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' ইত্যাদি।

বহুখণ্ডযুক্ত উপন্যাসগুলোতে বিস্তৃত একটি সময়কে ধরার চেষ্টা করা হয়। বেশির ভাগ উপন্যাস সময়ের পালাবদলের সঙ্গে প্রজন্মগত সংঘাতময় জীবন, সমাজ-চেতনা, দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সংকটময় সময়ের দলিলরূপে রূপায়িত হয়ে থাকে।

প্রকৃতিপ্রেমী বিভূতিভূষণ প্রকৃতি এবং মানবজীবনের সংমিশ্রণে তার যাত্রারম্ভ করেছেন। তাঁর

অন্তরে লালিত 'অপু' কে তার স্বপ্ন এবং জীবনের সংগ্রামকে এক খণ্ডে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। 'পথের পাঁচালী'তে যেন তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 'পথের পাঁচালী'র শেষের উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায়–

> *"পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন – মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে, ট্যাঙারে বীরু রায়ের বটতলায় কি ধলাচিতের খেয়াঘাটের সীমানায় তোমাদের সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেএবতীর খেলায় পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে... দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে; জানার গণ্ডি এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশ্যে... সে পথের বিচিত্র আনন্দ যাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া করে এনেছি।... চল এগিয়ে যাই।"*[১০]

লেখকের অসম্পূর্ণ বক্তব্যকে স্পষ্ট করতেই 'অপরাজিত অপু'তে এই রচনার সম্প্রসারণ। তারপরও তার ইচ্ছা ছিল অপুর ছেলে কাজলকে নিয়ে আরও এগোনোর কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু ইচ্ছা পূরণ করতে দেয়নি। পরবর্তী সময়ে পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তা রচনা করেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী প্রথার বিলুপ্তির চিত্র অঙ্কন করেছেন 'ধাত্রীদেবতা'য়। জনগণের মূল শক্তির জাগরণ এবং তার গুরুত্বের বিবরণ দিয়েছেন 'গণদেবতায়' এবং 'পঞ্চগ্রামে' দেশের মিলিত শক্তি অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শক্তিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এভাবে তারাশঙ্কর খণ্ডে খণ্ডে বিন্যস্ত প্রতিবেদনে ধাবমান পরিবর্তনের ছবিকে বিস্তৃত সময়ের ব্যবধানে তুলে ধরেছেন। যা একটি খণ্ডে প্রকাশিত হলে বিবর্তিত সময়ের উত্থান পতনকে রূপায়িত করা যেত না।

আশাপূর্ণা দেবী অবহেলিত, অবদমিত, লাঞ্ছিত নারী জীবনের যন্ত্রণার সংগ্রামময় জীবনকে তুলে ধরতে তিনটি খণ্ডে তিনটি প্রজন্মকে বর্ণনা করেছেন। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে সত্যবতীর স্বামী ছলনা করে তাদের মেয়ে সুবর্ণলতার বিয়ে দিয়েছিলেন। সত্যবতী স্বামীর কাছে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিল সুবর্ণের বাল্য বিবাহ না দিতে। স্বামী এবং শাশুড়ি বিশ্বাসঘাতকতা করে সুবর্ণের বিবাহ দেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হওয়ায় সত্যবতীর বিশ্বাস ভঙ্গ হয়। তাই সে এক মুহূর্তে সংসারের মোহ ত্যাগ করে গৃহত্যাগী হয়। সমাজ, সংসার তার এই ভুলকে ক্ষমা করে না। যার ফল সারাজীবন ধরে সুবর্ণলতাকে গঞ্জনা ভোগ করতে হয়েছে।

কখনও মায়ের প্রতি সমব্যথী হয়ে কখনও অভিমানে চোখের জল ফেলেছে। তার এই যন্ত্রণাকে আজীবন সে বুকে জব্দ করে রেখেছিল। বিশেষভাবে সে মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষায় পূর্ণ মানুষ রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু একটু বড় হয়ে বকুল ছাড়া বাকি সবাই পরিবারের রঙে রঞ্জিত হয়ে যায়। সারাজীবন সে অপমানের বোঝা নিয়েই জীবন কাটিয়ে গেছে। তার সেই ক্ষোভ, যন্ত্রণা বুকের গভীরে পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। তার ভাবনা-চিন্তা, জীবনকে অপটু হাতে লিখতে বসেছিল। কিন্তু সবাই ঠাট্টা, পরিহাস করলে সুবর্ণলতা তার সব সঞ্চিত স্মৃতিকথা পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। তার সমস্ত ক্ষোভ যন্ত্রণা আগুনের সঙ্গে পুড়ে যায়। এভাবেই মৃত্যুকে আহ্বান জানিয়ে নিজেকে সঁপে দেয় মৃত্যুর কাছে। তার মৃত্যুর পর বকুল পণ করে মায়ের বোবা যন্ত্রণার ইতিহাস সে সবাইকে জানাবে। যা 'বকুলকথা'র মূল বক্তব্য। এভাবে আশাপূর্ণা তিনটি খণ্ডে তিনটি নারীকে প্রতিনিধি করেছেন তিনটি প্রজন্মকে তুলে ধরতে। বহুখণ্ডযুক্ত (Multivolumed) উপন্যাসের গুরুত্ব কোথায়, কেন, তা বোঝাতে আশাপূর্ণা দেবীর ভূমিকায় লেখা উদ্ধৃতিটি লক্ষ করা যেতে পারে –

> *''আপাতদৃষ্টিতে 'সুবর্ণলতা' একটি জীবন কাহিনি, কিন্তু সেইটুকুই এই গ্রন্থের শেষ কথা নয়, 'সুবর্ণলতা' একটি বিশেষ কালের আলেখ্য। যে কাল সদ্য বিগত যে কাল হয়ত আজও বা সমাজের এখানে সেখানে তার ছায়া ফেলে রেখেছে। 'সুবর্ণলতা' সেই বন্ধন জর্জরিত কালের মুক্তিকামী আত্মার ব্যাকুল যন্ত্রণার প্রতীক।*
>
> *আর একটি কথা বলা আবশ্যক। আমার 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' গ্রন্থের সঙ্গে এর একটি যোগসূত্র আছে। যে যোগসূত্র কাহিনির প্রয়োজনে নয়, একটি 'ভাব'কে পরবর্তী কালের ভাব-ধারার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনে।*
>
> *সমাজ বিজ্ঞানী লিখে রাখেন সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস, আমি একটি কাহিনির মধ্যে সেই বিবর্তনের একটি রেখাঙ্কনের সামান্য চেষ্টা করেছি মাত্র।''*[১১]

এই মূল ভাবধারারই সম্প্রসারণ তৃতীয় খণ্ড 'বকুলকথা'।

ট্রিলজির আলোচনায় অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের বিবরণে

বলেছেন–

> *''বস্তুত তিন পর্বে সমগ্র 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' ট্রিলজি বিংশ শতাব্দের ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) সামাজিক চালচিত্র।''*[১২]

সুদীর্ঘ জীবনকালের একটি সামগ্রিক আলেখ্য তিনপর্বের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে। দেশের ভাঙাগড়ার ইতিহাস তার সঙ্গে মানুষের বিশৃঙ্খল জীবনের ইতিহাস। শুরু হয়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে কিন্তু ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধেও তার সমাপ্তি ঘটেনি। প্রচ্ছন্নভাবে আজও তা জীবনের দেশের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে আছে। এই তিন পর্বে বিবৃত উপন্যাসে দেশের আর্থ-সামাজিক বিবর্তনেরও ইতিহাস উঠে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে একজন কিশোরের বিবর্তিত জীবনেরও ইতিহাস এই 'উপন্যাসত্রয়ী'। এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র জাহাজের কোলবয় জীবন অভিজ্ঞতায় তিনটি প্রজন্মকে কীভাবে দেখেছে, বুঝেছে তারই আলেখ্য। সমুদ্রে 'কোলবয়' রূপে পরিচিত সোনা উর্ফে অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিকের অভিজ্ঞতা আর বিচিত্র সংসার-সমুদ্রে সতত কর্মরত কারখানা-ম্যানেজার অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিকের অভিজ্ঞতা একই সত্তার কালিক অভিজ্ঞতার কথা।

আবার লেখকের কথায়–

> ''বাল্য ও কৈশোরের সোনা; জাহাজের 'কোলবয়' ওরফে ছোটবাবু আর পরিণত জীবনে অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক লেখকেরই তিন সত্তা-সবটা মিলিয়ে এক সত্তা, যে জীবনের শিল্পী।''[১৩]

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' প্রথম পর্ব (১৯৩০-৫২) এই সময়সীমায় পূর্ববঙ্গের গ্রামজীবনের আভ্যন্তরীণ পরিচয় বিধৃত হয়েছে। প্রথম পর্বে কিশোর সোনাকে পাই। এখানে উদ্ভাসিত হয়েছে হিন্দু-মুসলিম, ধনী-মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত গ্রামীণ জনজীবন। বিশ্বে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন মহাযুদ্ধের ফলে ঢাকা, কলকাতায় যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, অশান্তি দেখা দেয় তার প্রভাব পড়ে গ্রামজীবনে শান্তি বিঘ্নিত হয়। এই উপন্যাসে লক্ষ করা যায় জলস্রোতের মত সময়স্রোতের অব্যাহত গতি। দেশ বিভাগের মর্মান্তিক যন্ত্রণা, বেদনা, বিশৃঙ্খল, উত্তাল জনজীবন ও দেশবিভাগের পরবর্তী উদ্বাস্তু বিপর্যয়– সব কিছুকে ধারণ করে গড়ে উঠেছে এক অখণ্ড জীবনবোধ। তিনটি খণ্ডেরই পর্যবেক্ষক সোনা - ছোটবাবু-অতীশ-দীপঙ্কর ভৌমিক মানে কৈশোর, যৌবন ও পরিণত কালের সোনা। দেশ বিভাগের বিপর্যস্ত সময়ের সঙ্গেই 'নীলকণ্ঠ

পাখির খোঁজে' উপন্যাসের সমাপ্তি।

দ্বিতীয় পর্ব 'অলৌকিক জলযান'– কিশোর সোনা এখানে প্রাপ্তবয়স্ক যুবক। দেশ বিভাগের অসহনীয় যন্ত্রণা, মর্মবেদনা, উদ্বাস্তু জীবনের চরম ক্লেশ অভাব, অনটনে জীবিকার অন্বেষণে সম্পূর্ণ নতুন পথে তার যাত্রারম্ভ। 'অলৌকিক জলযান'-এ জীবিকারূপে সোনা (ছোটবাবু) জাহাজে 'coolboy' এর কাজ পেল। এই জাহাজ যাত্রাতেই তার বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতা, দুঃসাহসিক জীবন-যাপনের কাহিনি এবং কৈশোরের স্মৃতিই ছিল সম্বল। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' ট্রিলজির শেষখণ্ড 'ঈশ্বরের বাগান'। সোনার সুদীর্ঘ জীবন কাহিনি অর্থাৎ শৈশব কৈশোর ও যৌবনের সংঘাতময় জীবন সংগ্রামের বিবর্তনের মধ্যে তার দৃষ্টিতে দেখেছি দেশের বিস্তৃত বিপর্যস্ত ইতিহাসের চিত্র। এখানে কিশোর সোনা এবং জাহাজের কোলবয় (ছোটবাবুর) পরিচয় অতিক্রম করে সোনা পরিণত 'অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিকে'। লেখকের বক্তব্যে –

> *''তিন পর্বে একই ব্যক্তি সত্তা ভিন্নতর সত্যে উদ্ভাসিত যেমন একই শক্তি মহাজাগতিক নিয়ন্ত্রণে নানা ব্যঞ্জনায় নিত্য প্রকাশিত।''*[১৪]

এই খণ্ডে খণ্ডে বিন্যস্ত বহুখণ্ডযুক্ত (multivolumed) উপন্যাস, দেশের এক বিশাল পটভূমিকে প্রসারিত করেছে যার মূল বক্তব্য এক খণ্ডে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব ছিল না। (১৯৩০-১৯৭০) এই সময়সীমায় বিধৃত জীবন ইতিহাস, সমাজ ইতিহাস উদাসীন প্রকৃতি ও উদ্বাস্তু জনজীবনের পটভূমি 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'র পর্বে উদ্ভাসিত। সময়ের পর্যবেক্ষক, প্রতিনিধি সোনার অসহ্য জীবনক্লেশে জর্জরিত জীবিকার সন্ধানের বর্ণনা 'অলৌকিক জলযানে' বিধৃত। তার পটভূমি অনন্ত অসীম সমুদ্র। ৩য় পর্ব ছত্রভঙ্গ নগর, গ্রামীণ জনজীবনের উদাসীন ও নিরালম্ব বেঁচে থাকার অন্তঃশীল স্রোত ও জগৎ। এভাবে লেখক দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের বিশৃঙ্খল ইতিহাসকে খণ্ডে খণ্ডে বিন্যস্ত করে একসূত্রে শিল্পিত করেছেন।

'উত্তরাধিকার' (১৯৭৯), 'কালবেলা' (১৯৮৩), 'কালপুরুষ' (১৯৮৫) সমরেশ মজুমদারের বহুখণ্ডিত উপন্যাস (multivolumed) যা 'Trilogy'-তে পরিণত। লেখকের বক্তব্যে– 'মোটামুটি ১৯৪০ থেকে ১৯৮৫ এই পয়তাল্লিশ বছরের কাহিনি–অখণ্ড ভারত থেকে খণ্ড ভারত।' স্বাধীনতা, নানা রাজনৈতিক আন্দোলনে অস্থির পশ্চিমবঙ্গের কাহিনি এই তিন পর্বে প্রসারিত। এখানে প্রধান চরিত্র 'অনি' অনিমেষ এর পিতামহ সরিৎশেখর তাহার বাবা, কাকাদের এবং পরবর্তী সময়ে অর্কের জীবন কাহিনি। মূলত জীবন কীভাবে বিভিন্ন আবর্তে রাজনৈতিক সংগ্রামে জড়িত হয়ে যায় তারই ইতিহাস বহন করেছে এই ত্রয়ী।

সময়ের পালাবদলে মানুষের চিন্তাধারা, বিপ্লবের রূপ পাল্টে যায় কিন্তু সময়ের গতি থামে না। ঠিক তেমনি জীবনও চলতে থাকে তার গতিতে। এখানে তিনটি প্রজন্মের ব্যক্তিগত জীবন রাজনৈতিক আবর্তের সংঘাতে প্রসারিত হয়ে চলেছে। এখানে একটি খণ্ড অন্যটির সঙ্গে ভাবরক্ষা করে পরিবর্তিত রূপরেখাকে স্পষ্ট করে চলেছে। বিস্তৃত '৪৫' বৎসরের দীর্ঘ কাহিনির মধ্যে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সাধারণ জনজীবনের নব উত্থিত জাগরণের কাহিনি পর্বে পর্বে চিত্রিত করেছেন লেখক।

> *"উত্তরাধিকার (১ম পর্ব) ও 'কালবেলা'র (২য় পর্ব) কালপুরুষ' (৩য় পর্ব)। যে ঘটনা স্রোতের সূচনা হয়েছিল আঙরাভাসা নদীর তীরে স্বর্গছেঁড়া গ্রামে নায়ক অনিমেষের জন্মলগ্নে (১১৪০), তা পরিণতিতে উপনীত হল পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীর শক্তির ক্ষমতা দখলের পরে পরেই। প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ প্রবাহিত জীবনধারার সামগ্রিক পরিচয় তিনটি পর্বে বিধৃত।"*[১৫]

চৈতন্যপ্রবাহ রীতির নতুন আমেজে প্রস্তুত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ট্রিলজি অন্তঃশীলা (১৯৩৫), আবর্ত (১৯৩৭), মোহানা (১৯৪৩)। অন্তঃশীলা উপন্যাসের ২য় সংস্করণের ভূমিকায় লেখকের বক্তব্যকে তুলে ধরা যেতে পারে —

> *"সেটি 'এই জীবন' নামে গল্পের আকারে 'পরিচয়ে' প্রকাশিত হয়। শ্রী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য প্রভৃতি বন্ধুরা গল্পটির সম্ভাব্যতা লক্ষ্য করে তাকে পূর্ণায়নে নভেলের আকার দিতে আমাকে প্রবুদ্ধ করেন। একজন তথাকথিত ইনটেলেকচুয়ালের মানসিক অভিব্যক্তি দেখানোই আমার উদ্দেশ্য ছিল। বাস্তব জগৎ ও ভাবের রাজ্য থেকে পলায়নই হল খগেনবাবুর প্রথম প্রতিক্রিয়া কিন্তু পলায়ন অসম্ভব। নিজের অজ্ঞানে খগেনবাবুর রমলা দেবীর প্রতি আকর্ষণ হল অন্তঃশীলার বিষয়। খগেনবাবুর ক্রমবিকাশ এইখানেই শেষ হয়নি। আবর্ত ও মোহানায় সেই ধারা চলছে।"*[১৬]

অন্তঃশীলা উপন্যাসের সূচনা খগেনবাবুর দাম্পত্য জীবনের ভাঙন দিয়ে। স্ত্রী সাবিত্রীর আত্মহত্যা, স্ত্রীর বান্ধবী রমলা দেবীর সাদর আপ্যায়ন খগেনবাবুকে কিছুটা স্বস্তি দেয়। রমলাদেবীর পরিচিত বন্ধুসম সুজনের বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতায় তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন। এর পটভূমি বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের

কলকাতা শহর। এখানে বিশেষত বিপন্ন মানসিকভাবে বিধ্বস্ত খগেনবাবুর আত্মচিন্তা, আত্মমগ্নতা, নিষ্ক্রিয় জীবনাচরণ লক্ষিত। সাবিত্রীর মৃত্যুর পরে একাকী বিপন্ন মুহূর্তে এগিয়ে এলেন রমলাদেবী। তারপর থেকেই পরস্পরের প্রতি প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ, একজন আরেকজনের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু অর্ন্তমুখীন খগেনবাবু কোনো আত্মিক বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে চান না। তাই তার কাশীতে যাত্রা শুধু আত্ম পলায়ন নয়, রমলাদেবীর আকর্ষণ থেকেও সরে যাওযার চেষ্টা এবং খগেনবাবুর আত্মানুসন্ধানের যাত্রা।

পরবর্তী সময়ে রমলা দেবীর একান্ত সচেতন প্রচেষ্টায় খগেনবাবুর সঙ্গে কাশীতে সাক্ষাৎ হয়। রমলাদেবী খগেনবাবুর প্রতি আকর্ষণ, আবেগ স্বীকার করেন। খগেনবাবুকেও বাধ্য হয়ে ধরা দিতেই হয়। কাশীতে বিভিন্ন আবর্তের মধ্য দিয়ে রমলা ও খগেনবাবুর সম্পর্কের ভাঙাগড়া। বিভিন্ন সমস্যাসংকুল পরিস্থিতিতে রমলা ও খগেনবাবু পরস্পরের প্রতি আরও আকৃষ্ট হন। কাশীতে মাসিমার মৃত্যুর পর দু'জনের সহবাসেও আর বাধা থাকল না।

> *''আত্মশুদ্ধির অস্বাভাবিক প্রচেষ্টায় খগেনবাবু আত্মম্ভরি হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন নৈরাত্মবোধের সংকল্পে চিত্তকে বহির্মুখী করাই তার একমাত্র প্রতিকার। অন্তঃশীল প্রবাহকে বহির্মুখী না করলেই মজে যায়, অথবা আবর্তের সৃষ্টি হয়। একি হল! এতদিন সংস্কারের মূলধন ভাঙিয়ে চলল; আজ একটিও কানাকড়ি নেই। যা বাকি ছিল সব গচ্ছিত রাখলেন, বাঁধা পড়ল রমলার হাতে।''*[১৭]

মাসিমার মৃত্যুর পরই 'মোহানা' উপন্যাসের সূচনা। সাবিত্রীর মৃত্যুর ঘটনা দিয়ে অন্তঃশীলার সূচনা। এই মৃত্যুকে ঘিরে খগেনবাবুর রমলা, সুজন বিজনের সংস্পর্শে আসা, আত্মানুসন্ধানের অভিপ্রায়ে কাশীতে অভিযাত্রা। কিন্তু অবশেষে রমলার কাছেই সমর্পণ। কিন্তু এখানেই খগেনবাবুর শেষ হয়নি। কাশী, হরিদ্বার ও লখনউ হয়ে কানপুরে। সেখানে লক্ষ করেছেন শ্রেণী-সংগ্রাম, যা রাজনৈতিক সমস্যারই অঙ্গ এবং শেষে তা পরিণত হয় অর্থনৈতিক সমস্যার অঙ্গরূপে। খগেনবাবু নিজের অজান্তেই জড়িয়ে পড়েছেন বিভিন্ন আবর্তে। আসলে এই 'ত্রয়ী' (Trilogy) ব্যক্তি খগেনবাবুর অন্তর্মুখীনতা থেকে ক্রমশ রমলা, সুজন, বিজনের সংস্পর্শে বহির্মুখী চিন্তা চেতনায় উপনীত হয়ে বৃহত্তর সমষ্টি চেতনায় রঞ্জিত হয়েছে।

মোহানা উপন্যাসের ভূমিকায় ধূর্জটিপ্রসাদ নিজেই লিখেছিলেন–

"প্রথম দু'টি খণ্ড 'অন্তঃশীলা' ও আবর্তের সমালোচনা পড়ে মনে হয়েছিল যে তৃতীয় খণ্ডের প্রয়োজন রয়েছে। আমার নিজের বিশ্বাসও ছিল তাই। প্রধান দু'টি চরিত্র তখনও পরিণত হয়নি। পরিণতির অর্থ যে উন্নতি নয় এটুকু অবশ্য জানতাম। পরিস্থিতির মধ্যে শক্তি গুপ্ত থাকে তাকে সুযোগ দেওয়া যেমন নেতার কাজ তেমনই লেখকেরও। বাকিটা সচেতন সাপেক্ষ।"[১৮]

ত্রিশের দশকের তিনটি দিন যাকে মহাকালের দুই দশকের ইতিহাস বলা যায়। গোপাল হালদারের ট্রিলজি 'ত্রিদিবা'র ৩টি খণ্ড 'একদা' (১৯৩৯), 'অন্যদিন' (১৯৫০), 'আর একদিন' (১৯৫১)।

গোপাল হালদারের 'ত্রয়ী' উপন্যাসের শৃঙ্খলাবদ্ধতায় মাত্র একদিনের গভীর সত্যের রহস্য উন্মোচনই ছিল লেখকের লক্ষ্য। 'ত্রিদিবা' ত্রিশের দশকের উত্তাল সময়ের চলচ্ছবি। দীর্ঘ প্রায় বিশ বৎসরের উত্তাল অস্থির সময়ের দুর্বার গতিময় ইতিহাসকেই একজন প্রাণবান কর্মঠ চেতনালব্ধ মানুষের ভাবনায় স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে উদ্ঘাটিত করাই ছিল লেখকের প্রয়াস।

'ত্রিদিবা' এর তিনটি পর্ব বা উপন্যাসের উপজীব্য তিনটি দিন অর্থাৎ অমিতের তিনটি দিন অতিবাহিত হতে হতেই পেরিয়ে যায় বাঙালি মধ্যবিত্তের দুই দশকের অন্তর্গত ইতিহাস। এই ইতিহাস চলিষ্ণু, যার যাত্রা শুধু সামনের দিকে। এই উপন্যাস ত্রয়ী অতীতের ধারক, বর্তমানের বাহক ও দলিল এবং ভবিষ্যৎ এর বার্তাবহ। এখানে মুখ্য চরিত্র অমিত ইতিহাসের ছাত্র। দেশের অস্থির বিপ্লবী আন্দোলনের সময় সে চাকুরীজীবী স্থায়ী জীবনকে মেনে নিতে পারেনি। তাই তার জীবনে রয়েছে অন্তহীন জীবন জিজ্ঞাসা। অমিতের জীবন জিজ্ঞাসার মর্মমূলে রয়েছে প্রখর রাজনৈতিক চেতনা। মানুষের প্রকৃত পরিচয় ও জীবনের পরম সত্য অণ্বেষণ; মানবিক চিন্তাবৃত্তে উত্তরোত্তর বিকাশের প্রত্যয়। ধাবমান প্রবাহিত মহাকালের স্বাক্ষরকে সাধারণ মানুষের বিপ্লবী চেতনার ইতিহাসকে লিখে রাখতেই গোপাল হালদারের এই খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত উপন্যাসের যোগসূত্র দরকার ছিল। যা তাঁর ক্রমবিকশিত জীবন-চেতনার পরিচায়ক। অমিত জীবনের বিচিত্র দৃশ্যসম্ভার থেকে বুঝেছে –

"কোনো একক দিন তুচ্ছ নয়, তা চিরদিনের সূর্যালোকে উজ্জ্বল ক্ষণিক বুদ্‌বুদ্ মানুষের জীবনের এক একটি দিনও যেন কালের-ই যাত্রা পথের এক একটি

মুক্ত বাতায়ন।"[১৯]

'ত্রিদিবা' উপন্যাসের প্রথম পর্ব 'একদা' চব্বিশ ঘণ্টার কাহিনি। এখানে প্রধান চরিত্র অমিত সত্যের অন্বেষণ করেছে। অমিতের জীবনবোধ, জীবনের প্রতি ভালবাসা 'এই ভালবাসা মর্ত-মমতার প্রতি আকর্ষণ, দেশের মানুষের প্রতি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি স্থান লাভ করেছে। কর্ম চঞ্চল জীবনকে সে ভালবাসে, কর্মের মধ্য দিয়ে তার ছোট 'আমি' থেকে বড় 'আমি'তে যাত্রার সূচনা। 'শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারনের, গ্লানিময় জীবন তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সে জীবনের মহত্ত্বকে স্পর্শ করতে চায়। কিন্তু কোন্‌পথে জীবনের সেই সত্যকে সে পাবে? অমিতের এই সত্যান্বেষণ তার কথায়ই বোঝা যায়–

> *"জীবনের মানে আরও বেশি– সে শুধু গাঁথিয়াই শেষ হয় না।.... সে চাহে বিকাশ.... বিকাশ আপনার পরিপূর্ণতায়, চেতনার তীব্রতায় অনুভূতির গভীরতায়, কর্মের ঔজ্জ্বল্যে। দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান ইটারনিটি ইন্ ইন্‌টেন্‌স লিভিং।"*[২০]

'একদা' উপন্যাসের সমাপ্তি– ভোরবেলায় পুলিশ এসে অমিতকে নিয়ে যায়। অর্থাৎ 'অন্যদিন' এর সূচনা কারাজীবনে। দ্বিতীয় পর্ব 'অন্যদিন'। তাঁর কর্মজীবন থেকে কারাজীবনের বিচ্ছিন্নতা আত্মসমালোচনা এবং বিভিন্ন রাজবন্দীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় রাজনৈতিক মতাদর্শের ঐক্য-অনৈক্য বিশ্লেষণের সুযোগ হয়ে ওঠে। এই জেল তার কাছে বিশ্ববিদ্যালয় সমান মনে হয় তখন। এখানেই বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী জ্ঞানী, রাজবন্দীদের সঙ্গে মত বিনিময়ে অমিত একটা আপাত মীমাংসায় পৌঁছতে পারে। জেল থেকে রেহাই পাবার পর অমিত দেখে তার পরিচিত বাইরের জগতে অনেক কিছু বদলে গিয়েছে আজ তাই অন্য এক জীবনের শুরু 'আর একদিন'।

ত্রিদিবায় একটি মহাসময়ের পালাবদলকে ধরে রাখতে গোপাল হালদার সচেতনভাবেই তিনটি খণ্ডে বিভক্ত করেছেন তাঁর রচনাকে। 'একদা'য় বিশৃঙ্খল অস্থির সময়ে সঠিক মতাদর্শ গ্রহণে দোলাচলতা। তার মধ্য থেকেও যথাযথ সিদ্ধান্তে বৈপ্লবিক সংগঠনের কাজকর্ম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিগদর্শন। 'অন্যদিন' এ তার বিকাশ। 'আর একদিন'-এ বিপ্লবী আন্দোলনকারীদের আন্দোলন পৌঁছেছে সমাপ্তির দিকে। ভারতের স্বাধীনতার সূর্য উদিত হতে চলেছে। কিন্তু এই স্বাধীনতাকামী সংগ্রামের বিপ্লবীদের নিরাপত্তা আইনের অধীনে আই, বি তে আটক করা হয়েছে। দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় অমিত এবং অন্যান্যরা জানে নিরাপত্তা

আইনের নামের ছলনায় তাদের জেলে যেতে হবে। এটাই সত্য।

বহুখণ্ডযুক্ত উপন্যাস প্রথমত আত্মজৈবনিক উপাদানকে আধার করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে প্রসার লাভ করে। যেখানে থাকে লেখকের সমস্ত জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতা, জীবনদর্শনের মূল নির্যাসটুকু। জীবন, সমাজ, সময়ের ঘাত-প্রতিঘাতে তিনি যে মূল্যবোধ অর্জন করেন তার মূল স্বরূপটি উন্মোচনে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন। জীবনের বিশেষ অভিজ্ঞতাকে, সমস্ত জীবনের পুঞ্জিত ভাবাদর্শকে, নৈতিক দায়বোধকে (commitment) বিস্তৃত একটি রচনায় ধারণ করার প্রবণতা লক্ষ করা যায় এই আত্মজৈবনিক উপাদান সম্পন্ন উপন্যাসের খণ্ডে খণ্ডে বিন্যস্ত ধারাবাহিকতায়। আর এই বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রতিবেদনই খণ্ডে খণ্ডে বিন্যস্ত উপন্যাস বিশাল কালপর্বের অখণ্ড সৃষ্টি আত্মজৈবনিক উপাদান সমৃদ্ধ উপন্যাস নতুন ধরনে, নতুন পথে, একটি নতুন যাত্রারম্ভের সূচনা মুহূর্ত তৈরি করে। যা একদিকে রচয়িতার আত্মজৈবনিক উপাদানে সমৃদ্ধ অন্যদিকে সমাজের বাস্তব ও অন্তর্বাস্তব, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সাহিত্যের নান্দনিক সৌন্দর্যের খাতিরে যথোপযুক্ত কল্পনার যুগলবন্দিতে সার্থকতা লাভ করে।

তথ্যসূত্র :

১। শ্রীশচন্দ্র দাশ, 'সাহিত্য সন্দর্শন', বামা পুস্তকালয়, কলকাতা-৭৩, ১৯৯৬, পৃ: ১৫৩-১৫৪

২। John Halpemin, The theory of the Novel, New critical idiom, London, 1997, P-122

৩। তদেব, পৃ: ১২২

৪। তদেব, পৃ: ১২৬

৫। তদেব, পৃ: ১২৩

৬। তদেব, পৃ: ১৩৫

৭। তদেব, পৃ: ১২৩

৮। তদেব, পৃ: ১৩০

৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা-৭, ১৩১৪, পৃ: ২৩, ২৫

১০। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পথের পাঁচালী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, ১৪১৭ ভাদ্র, পৃ: ২০৮

১১। আশাপূর্ণা দেবী, সুবর্ণলতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, ১৯৬৬, ভূমিকা অংশ

১২। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসে ট্রিলজি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ২০০৭, পৃ: ১৭৪

১৩। তদেব, পৃ: ১৫৮

১৪। তদেব, পৃ: ১৭২

১৫। তদেব, পৃ: ১৯৫

১৬। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী - ১/, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ২০১১, ভূমিকা, পৃ: ৪২০-৪২১

১৭। তদেব, পৃ: ২৯০

১৮। তদেব (পরিশিষ্ট), পৃ: ৪৩৭

১৯। গোপাল হালদার, গোপাল হালদার রচনাসমগ্র - ১ম খণ্ড, এ মুখার্জি এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭৩, ২০০০, পৃ: ১

২০। তদেব, পৃ: ১২২